দ্বিতীয় অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন

বুদ্ধদেব বসুর বিভিন্ন গল্পে আমরা দেখতে পাই দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন। গার্হস্ত্য জীবনের বহুকৌণিক সম্পর্ক ও বহুবিধ পরিস্থিতি নির্ভর আটপৌরে কাঠামোয় বুদ্ধদেব গল্প লেখেন অনেকদিন পর্যন্ত। দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন বুদ্ধদেবের গল্পগুচ্ছে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, তাঁর কয়েকটি গল্প যেমন— 'অদৃশ্য শত্রু', 'জ্বর', 'প্রশ্ন', 'তুলসী গন্ধ', প্রভৃতিতে দাম্পত্য সম্পর্কের বিভিন্ন দিক লক্ষ করা যায়।

বুদ্ধদেব বসুর 'অদৃশ্য শত্রু' গল্পের সোমেশ বিড়ম্বিত তরুণ লেখক। স্ত্রী সুধার প্রতি তার ভালোবাসা এতটাই যে সুধাকে কোনো শরীরের কাজ করতে দেখলে সোমেশ সহ্য করতে পারে না। কিন্তু নিজের অবধারিত অক্ষমতার চেতনায় মনের যন্ত্রণা তার তীব্রতর হয়ে ওঠে। এক এক সময় তার মনে হয়, ব্যাহত আর্থিক অবস্থা নিয়ে বিয়ে করা বোধহয় তার ভুল হয়েছে। গল্প লিখে সে সংসার চালায়, খ্যাতির অনুপাতে তার উপার্জন তুচ্ছ। স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক আর লেখক হিসেবে তার নিজস্ব উচাটন— এই দুই প্রসঙ্গের অস্ফুট টানাপোড়েন নিয়ে গল্পটি তৈরী। হয়তো, একথাও বলা যায় যে, এই টানাপোড়েন লক্ষ্য না করলেও চলবে। তারপর থেকেই চরাচর মধুরতর হয়ে উঠতে থাকে তার কাছে। এতদিনের না দেখা অথচ চেনা অনেক কিছুই নজরে পড়ে তার। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়েলের বৃহদায়তনের স্থূল, অতিস্থূল পার্থিবতার বিরুদ্ধে মানবাত্মার উর্দ্ধগামী অভীপ্সার মতো সেন্ট পলস্— এ দীর্ঘ চূড়া কী শান্ত— অথচ কী তীব্র প্রতিবাদ, তা জল্পনা করে সোমেশ মুগ্ধ হয়ে যায়। এতদিন থেকে সে কলকাতায়, অথচ এর আগে সে কখনো এই

রাস্তায়, ঠিক এখানে সে দাঁড়ায়নি। ঠিক এই পর্যায়েই অসুস্থ হয়ে পরে সুধা। সকলের অলক্ষ্যে, অথচ নিশ্চিত সৃষ্টির মূলে যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। এমন সময় মনে হল সোমেশের, তার সুধার অসুখ করা উচিত ছিল? নিজের পুলক ব্যাহত হবার বিরক্তি থেকে কিন্তু এই উচ্চারণ নয় সোমেশের, বরং তার চারপাশে যে নতুন পৃথিবীর উদ্ভাস, সুধা তা টের পেল না বলেই এই আক্ষেপ সোমেশের।

১৯২৮-এ লেখা বুদ্ধদেবের 'জ্বর' গল্পে পূর্ববঙ্গের এক কলেজের তরুণ অধ্যাপক ও একদা তাঁর প্রণয়ী ও বিবাহিত স্ত্রীকে সহজে চিনে নেওয়া যায়। আলোচ্য গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র রমাকান্তের অসুস্থতা, রোগজনিত বিকার, নির্জন মনের ক্রিয়া, স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্কের টানাপোড়েন, আড্ডা এবং ক্রসওয়ার্ড পাজল এর সঙ্গে মিশে একটি নিয়ন্ত্রিত দুর্ঘটনা রচনা করেছে। গল্পটির মধ্যে আমরা দেখতে পাই বন্ধুদের সাথে আড্ডার আসরে থাকা অবস্থায় রমাকান্তের হঠাৎ করে জ্বর বাঁধে। জ্বরের ঘোরে সে কিছুটা আবেগ প্রবণ হয়ে পড়ে। তাঁর মনে হয় জ্বরে তার শরীর পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর তার বন্ধুরা ক্রসওয়ার্ড পাজল নিয়ে ব্যস্ত, বন্ধুদেরকে তাঁর খুবই স্বার্থপর মনে হয়, তাই সে বাড়িতে চলে আসে। এদিকে বাড়ি থেকে বেড়োতে তার স্ত্রী সুধা তাকে বারণ করেছিল, তাই সে নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করে। ঘরে এসেও সে দেখে সুধা তার অসুস্থতার কথা শুনেও খুব একটা আশ্চর্য হয়নি। সে আরও বিমূঢ় হয়ে পড়ে। বিকারের ঘোরে সে ভাবতে লাগল সেই সুধা, যাকে সে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসে এবং যে তাকে ভালোবাসে বলে এতকাল সে বিশ্বাস করত, সেই সুধা তাকে এখন আর ভালোবাসে না। কোনও কালে হয়তো বাসত। বিকারের ঘোরে সে নানা স্বপ্ন দেখতে থাকে, সে

দেখে তার মৃত্যু ঘটেছে, অনেক লোকের কাঁধে চড়ে সে শ্মশানে চলেছে। সুধা বিধবা হয়ে গেছে, কিন্তু তার পরনে চওড়া পাড়ের কাপড়, কপালে সিদুর, ঠোঁট দুটি পানের রসে টুকটুক করছে। সে আরও দেখে যে তার মৃত্যুতে সুধা একটু কাঁদলও না, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে তাকে বিদায় দিল। ক্ষোভে দুঃখে তার কান্না পেল, সে একেবারে যেন ভেঙে পড়ল। তারপর তার ঘুম ভাঙার পর সে অনুভব করল এরকম কিছুই ঘটেনি সে কেবলমাত্র স্বপ্নের মধ্যে ঘোরপাক খাচ্ছে। এভাবেই আমরা গল্পটিতে দেখতে পাই রমাকান্ত ও সুধার দাম্পত্য সম্পর্ক আর এই সম্পর্ককে নিয়ে টানানোড়েনের বিভিন্ন দিক।

'তুলসী গন্ধ' গল্পটিতে পাই এক বিবাহিত তরুণ-তরুণীর দাম্পত্য সম্পর্কের নানা দিক। গল্পটির প্রধান চরিত্র মিহির যদিও তার স্ত্রীকে প্রাণপণে ভালোবাসে কিন্তু তার চরিত্রের একঘেয়েমি ও স্বার্থপরতার জন্য তার স্ত্রী কমলা সেই ভালোবাসার মধ্যে তৃপ্তি বা স্বাদ পায় না। গল্পটি শুরু হয় মিহির কুমারের ঘুম ভাঙার দীর্ঘ অনুচ্ছেদ দিয়ে। মিহির কুমারের ঘুম ভাঙছে এক শীতের সকালে। ঘুম আর জাগরণের অর্ধ অবচেতনে তার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। মানুষটি বিদগ্ধ মনের অধিকারী। তার আলস্য, শীতের সকালে ঘুম ভাঙা বিছানায় তার আরামের মুহূর্ত, পাশের বালিশ থেকে সদ্য উঠে যাওয়া তার স্ত্রীর শরীরি অনুপস্থিতি, মনের ভেতরে যা এখনো জড়ানো। কমলার শরীর তার সারবস্তু ওই ওখানেই, ওই মিহির কুমারের শোবার বালিশের পাশেই ফেলে গেছে। কমলার বালিশের গর্ত আর গত রাতে তার মাথার চুলে মিহির কুমারের আঙুলের জড়ানো খেলার স্মৃতি ওই শীতের সকালে তাকে তৃপ্তির চাদরে ঢেকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে দেয় একেবারে। মিহিরবাবুর স্বামীত্বের অধিকারবোধ, তার কাজকর্ম, তার আলস্য, তার অবসর, সবই তার।

এসব একমাত্র তার দিক থেকেই জরুরি, এসব তাঁরই জন্য। কমলা এসবের বাইরে, মিহিরের জগতে কমলার প্রবেশ ও প্রস্থান মিহিরেরই জন্য, তারই হাতে নিয়ন্ত্রিত। কমলা মিহিরকে কাজের কথা মনে করিয়ে দেয়, আপিশে তাড়ার কথা মনে করিয়ে দেয়, যা যা করার সব করে। মিহির লেপের মধ্যে থেকে হাত বাড়িয়ে কমলাকে কাছে টেনে নেয়, মসৃণ বাধ্যতায় কমলা সমর্পণও করে নিজেকে।

গল্পটিতে দেখি মিহির ও কমলা কলকাতা ছেড়ে ঢাকা শহরে চলে এসেছে, এই শহরটি নাকি কমলার জন্মস্থান। কমলা এখানে এসে খুবই খুশি কিন্তু মিহির খুব একটা মন লাগাতে পারছিল না। কমলা প্রায় রোজই বেরিয়ে পড়ত তার পুরোনো জায়গাটাকে দেখার জন্য। একদিন সে পৌছে গেল তার নিজের পাড়াতে, সেখানে নাকি একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিলো, সেখানটা এখন খাঁ-খাঁ করছে। পাড়াটা পুরোপুরি বদলে গেছে কিন্তু এরকম না হয়ে উপায় নেই, প্রগতি থামতে পারে না। একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দেখলো কেউ নেই, দরজা বন্ধ দেখে অনেক প্রশ্ন মুখে নিয়ে সে দাড়ালো এবং একটি লোককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো যে ঘরটিতে এখন কেউ নেই, যারা ছিলো তারা একেবারে ছেড়ে চলে গেছে। ঘরটি নাকি কমলার এক প্রিয়জনের। কমলা একেবারে উদাস হয়ে ঘরে ফিরে দেখলো তার স্বামী খাটের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে টানছে চুরুট আর পড়ছে ইংরেজী নভেল। তারপর মিহির কমলাকে নিয়ে সিনেমা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলো কিন্তু কমলা রাজি হলো না। তার মন তখন দুঃখিত, কিসের এত দুঃখ প্রকাশ কমলা নিজেই বুঝতে পারছিল না। মিহিরও জানতে চাইলো না কমলার মন খারাপের কারণ। মিহিরের মতে তার আশেপাশে যা কিছু সব সময় ঠিক তারই মনের মতো হতে হবে; এক চুল এদিক-ওদিক হলে সে সহ্য করতে পারে না, তাই কমলার সিনেমায়

যাওয়ার কথা বারণ করা সে সহ্য করতে পারছিল না। মিহিরের অভ্যাস হলো অন্যের উপর অধিকার খাটানো তা কেউ স্বীকার করুক আর না-ই করুক। সে কমলাকে প্রবলভাবে ভালোবাসে বলে কথায় কথায় তার ঘোষণা করে। কোনো বাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে নিমন্ত্রণে গেলে সে বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দেয় যে সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে। সকলকে দেখাবার জন্য বা সকলে দেখে যাতে মুগ্ধ হয় তার জন্য সে যেমন করে পারে সর্বত্র জাহির করে বেড়ায়।

মিহির বারবার কমলাকে সিনেমায় যাওয়ার জন্য বলতে থাকে, কমলা বারবার না করেও যখন পারল না তখন হঠাৎ কমলার চোখে লুকোনো আগুন ঝলসে গেলো— ''না, ভালো না লাগা, মন খারাপ হওয়া, চুপ করে থাকা ইত্যাদি সবই তোমার একচেটিয়া ব্যাপার।''[১] কেউ তাকে ঠাট্টা করেছে বা কিছু বলেছে এমন সন্দেহও মিহিরের পক্ষে বিষের মতো, তাই সে বলে ওঠে— ''এ সব মেয়েলি ঢং দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।''[২] তারপর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নানান মতবিরোধ ও কথোপকথন হয়। মিহির জানতে চায় কী হয়েছে কমলার? তখন কমলা বলে ওঠে— ''আমি একজনকে ভালোবাসতাম— আজ তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।''[৩] কথাটি বলে কমলা চলে গেল। এভাবেই উক্ত গল্পটিতে বুদ্ধদেব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন জটিলতা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

গল্পটিতে দেখি মিহিরকুমার তার স্ত্রীকে প্রাণপণে ভালোবাসে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে শুধু ভালোবাসা হলেই চলে না একজনের মনে অন্যজনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হয়। শুধু নিজের কথা চিন্তা না করে অন্যজনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার

কথা ভাবতে হয়। অন্যজনের ভালো লাগাকে যখন নিজের ভালো লাগা হিসেবে গ্রহণ করা যায় তখনই গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক সুন্দর ও মধুর হয়ে ওঠে। উক্ত গল্পের মিহির কুমার এসবের উর্ধে, সে শুধু যানে যে সে কমলাকে ভালোবাসে, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা এসবের দিকে তার কোন আগ্রহ নেই। তাইতো কমলা মিহির কুমারের ভালোবাসায় কোন তৃপ্তি বা স্বাদ পায় না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক ভিন্ন সম্পর্কের নজির নিয়ে হাজির বুদ্ধদেব বসুর 'তুমি কেমন আছো' গল্পটি। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র অবনীশ ঘোষাল গ্লাসগো ও বার্লিনে পাশ করা এবং ডেট্রয়েটে ফোর্ডের কারখানায় নিযুক্ত প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে একজন তিনি। তাঁর দৈনন্দিন কর্মব্যস্ত জীবন স্ত্রীর অলস ও সামাজিক দিনযাপন এবং উভয়ের অবসর বিনোদনের বর্ণনা প্রকট করে অবনীশের একান্ত নিঃসঙ্গতা, উসকে দেয় বিমূর্ত নারীর প্রতি প্রেম। অবনীশবাবুর স্ত্রী মিলু একজন সমাজসেবিকা। সমাজে তারা দু'জন আদর্শ দম্পতি— ''মিলু আর আমি আদর্শ দম্পতি; আমাদের দেখাশোনা বেশি না হলেও আমরা নির্ভুলভাবে পরস্পরের দেখাশোনা করে থাকি, কথাবার্তা খুব কম হলেও ঝগড়াঝাঁটি কখনোই হয় না। মন-খারাপ, মেজাজ-খারাপ, মতভেদ, তর্কাতর্কি— এই সব উপদ্রবের অতীত আমরা। মিলুকে আমি মনে করিয়ে দিই তার ডেনটিস্টের কাছে যাওয়া উচিত; মিলু আমাকে মৃত্যু থেকে বাঁচাবার ইচ্ছায় সিগারেট ছাড়তে উৎসাহ দেয়।''[৪] তারা দু'জনই যে যার জগতে মত্ত, যে যার কাজে ডুবে আছে। দু'জনই সমাজের অতি গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব এবং নিজেই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তাদের কারোর কাছেই সময় নেই, শুধু তারা যে স্বামী-স্ত্রী, এই ঘোষণার মধ্যেই বন্দী দু'জনে। স্বামী-স্ত্রী একসাথে এক জায়গায় বসবে, একটু কথা বলবে, ছোটখাটো ঝগড়াঝাটি

করবে, কখনো প্রেম আবার কখনো দ্বন্দ্ব এসবের উর্ধে তারা দু'জনেই। অথচ তারা দু'জন সমাজের আদর্শ দম্পতি।

বুদ্ধদেব বসু আলোচ্য গল্পটিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক ভিন্ন ধরণের দাম্পত্য সম্পর্কের উদঘাটন করেছেন, যে সম্পর্কে সব ধরনের কর্তব্যবোধ আছে, যে যার দায়িত্ব ঠিক-ঠাক করে যাচ্ছে, কিন্তু কারোর জন্য কারোর কোনও সময় নেই।

বুদ্ধদেব বসুর হৃদয়ের জাগরণের প্রথম গল্প 'আদর্শ'। গল্পটিতে চলচ্চিত্র নায়িকা ও তার ব্যর্থ লেখক স্বামী অনিমেষের প্রেমহীন বিমুক্ত জীবনের খণ্ডচিত্র-এর কাহিনীভাগ সেখানে এসে পড়ে তাদের একদা প্রেমপূর্ণ দাম্পত্যপর্বের স্মৃতির ঝলক। সম্পর্কের সেতু বন্ধনে ব্যর্থ, হৃদয় উত্তাপের অন্বেষণে অপারগ দুই নারী-পুরুষের ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব গল্পটির সিংহভাগ জুড়ে আছে। গল্পটিতে আমরা দেখি একজোড়া স্বামী-স্ত্রী যাদের মধ্যে কোনও ঝগড়া-ঝাটি না থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই। তারা দু'জনেই সংসার সুন্দরভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিল। একটি কন্যা সন্তানও ছিল তাদের। কিন্তু হঠাৎ রূঢ় বাস্তবের আঘাতে দু'জনেই আলাদা হয়ে গেল। স্বামী অনিমেষ একদিন হঠাৎ প্রস্তাব দিলেন যে এবার তারা আলাদা হয়ে যাবে—

''তাতে তোমারও ভালো, আমারও ভালো। তোমার জীবন নিয়ে তুমি থাকবে, আমার জীবন নিয়ে আমি। চাও তো মাঝে মাঝে দেখাশোনা হবে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ আর থাকবে না। আইনমাফিক ডিভোর্স তুমি চাও তো হবে, তুমি না চাও তো হবে না। একটা কথা ঠিক জেনো যে আমি আর বিয়ে করবো না। বিয়ে-ঘরকন্না-ওসব আমার জন্য নয়। কিন্তু তুমি যদি কখনো মনোমতো আর কাউকে—''[৫]

মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে নায়িকা রমলা অভিনয় জগতে এতই নাম করেছে যে আজ সব জায়গায় সবার মুখে তারই কথা। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে বাড়ি-গাড়ি-জমি, অ্যালসেশিয়ান কুকুর পর্যন্ত, ইউরোপেও বেরিয়ে এসেছে। সব পেয়েও নিজের বলতে কেউ নেই তার কাছে। বাঁশধানির অতি নির্জনে তার বাড়িটি, কী নির্জন চারদিক, কী নিস্তব্ধ চর্তুদিক যেন খা-খা করছে। আধ বিঘে জমির মধ্যে ছোট্ট মনোরম একতলা বাড়ি, লোহার গেট, গেটে দারোয়ান, ভিতরে শিকারী কুকুর, সিন্দুকে অন্তত পক্ষে সত্তর হাজার টাকা। মাঝে মাঝে সে পাগলের মতো গয়না কেনে। রমলার জীবনে আজ সবকিছুই আছে, নেই শুধু তার একদা প্রেমীক স্বামীর ভালোবাসা। সে ফিরে যেতে চায় তার স্বামীর কাছে— ''আমি আমার মেয়েকে নিয়ে ফিরে যেতে চাই স্বামীর কাছে, মেয়ে তার বাবাকে চিনবে না এই যন্ত্রণা থেকে আমাকে মুক্তি দিন।''[৬] রমলা অনিমেষের কাছে আরেকটি পুত্র সন্তান ভিক্ষা মাগে। অনিমেষের কাছে প্রতিজ্ঞা করে— ''ভগবানের নাম দিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি তবু আমি তোমাকে আর বিরক্ত করবো না, সম্পূর্ণ মুক্তি দেবো তোমাকে। আর এসো না কোনোদিন, তাকিয়ো না আমার দিকে, আমার অস্তিত্ব ভুলে যেয়ো। সব মানবো। শুধু একটা ছেলে দাও আমাকে। দেবে? দেবে?''[৭] কিন্তু অনিমেষ আমাকে ক্ষমা করো বলে চলে গেলো, রমলা পড়ে রইলো চোখের জল নিয়ে। গল্পটিতে অনিমেষের অসম্পূর্ণ একটি উপন্যাসের কিছু টুকরো পাই যেখানে অনিমেষ কাকে যেন ফিরে আসতে বলছে— ''এসো, এসো, ফিরে এসো।''[৮] ফিরে এসো এই প্রার্থনায় ক্রন্দসী প্রতিধ্বনিত। ''ফিরে এসো, যৌবন; ফিরে এসো, প্রেম; ফিরে এসো, মন্ত্রপূত ঋতুরা। কেন মাথা নিচু করে আছো তোমরা, অঙ্গ কেন মলিন, গতি কেন ক্লান্ত? যারা পুঁথি না-পড়ে পা ফেলতে পারে না, মুখস্ত না করে

কথা বলতে পারে না, ঘণ্টা নাড়াকেই পূণ্য বলে জানে যারা, তারা কি তোমাদেরও লুটিয়ে দিয়েছে ধূলোয়? সেই স্থূলোদর বিপুল পাণ্ডারা, যারা সব মন্দির দখল করে নিয়েছে, তাদের কি এত শক্তি যে তোমাদের বুকেও শেল হানতে পারে? ঊষা, তোমাকে? নক্ষত্র, তোমাকে? কিন্তু তা-ই তো হবে, তোমরা ও যে প্রাকৃত।"[৯] অনিমেষের কিসের এত আক্ষেপ সে কাকে ফিরে আসতে বলছে, কি চায় সে কিসের জন্য সে রমলাকে ত্যাগ করেছে, এখন রমলার এত অনুরোধের পরও সে কেন তাকে গ্রহণ করছে না এটা বোঝা মুশকিল। গল্পটিতে শেষের দিকে অনিমেষের একটি বয়ান থেকে তার মনোভাব কিছু বোঝা যায়— ''রমলার একটা আদর্শ আছে। আমরাও একটা আদর্শ আছে। তার আপ্রাণ চেষ্টা তার আদর্শে পৌঁছতে; আমার, আমার। একই কাজ করছি আমরা, একই সঙ্গে কাজ করছি, কিন্তু সেই জন্যেই আর কখনো দেখা হতে পারে না।"[১০]

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'হতাশা' গল্পটিতেও দাম্পত্য সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তুলেছেন। এই গল্পে প্রেমের পরিচিত বিন্যাসটি উহ্য রেখে বুদ্ধদেব বসু দাম্পত্য প্রেমের একটি অনুচ্চারিত নকশা বুনেছেন। এই গল্পের নায়ক অনুপম নিষ্কর্মা, স্বপ্ন বিলাসী, পরিশ্রমবিমুখ, মিথ্যাচারী, কপট ব্যক্তি। তার স্ত্রী সুরমা আদর্শ বাঙালি গৃহবধূ। সুরমা খুব সুখে আছে শ্বশুড়বাড়িতে, শ্বশুর-শাশুড়ি তাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। এত স্নেহ করেন বলেই শ্বশুরের জন্য তার এত কষ্ট হয়। উপার্জন একজনের দাবি দশজনের। অনুপমই এই পরিবারের একমাত্র আশা। তার বাবার ইচ্ছে ছিল তাকে ছোটখাটো সরকারি চাকরি করাবেন। কিন্তু কেমন করে হবে অনুপমের ইচ্ছে এক রাতেই লাখপতি হয়ে যাবে, তাই বিজনেস-এর রাস্তায় নেমেছে। আজ এই বিজনেস, কাল অন্য কিছু। শেষমেষ কোনোটাই কাজে লাগে

না। সে দিব্যি খায়-দায় ঘুমোয়, বিকেলে হাওয়া খেতে বেরোয়, সিনেমাও দেখে। এই পরম নিশ্চিন্ত ভাবটা সুরমার একদম পছন্দ হয় না। কিন্তু তার পছন্দ না হলেই বা কি, অনুপম কি কারোর কথা শুনে। সে কথায় কথায় সুরমার উপর রেগে উঠে— ''কাল আপিশে বেরোবার আগে অনুপমের নতুন নেকটাই খুঁজে পাওয়া যায়নি— তাই নিয়ে কী কাণ্ড! সুরমা একাই নয়, তার শাশুড়ি, তার ইস্কুল গামী ননদ, হাঁকে-তাকে বিপর্যস্ত করে। অনুপম শেষপর্যন্ত ঘোষণা করেছিলো যে এমন বিশৃঙ্খল বাড়িতে মানুষের বসবাস অসম্ভব।''[১১] স্বামীর তুচ্ছতম সুযোগ-সুবিধের জন্য সুরমা তো প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু কেউ যদি পুরোনো চিঠিপত্রের দেরাজে নতুন নেকটাই ঢুকিয়ে রেখে পরে বাড়ির সবার উপর মেজাজ দেখায় তাহলে কেউ কিছু করতে পারবে না তাকে।

সুরমা অতি সাধারণ এক স্ত্রীলোক। সে এক আদর্শ গৃহবধূ। সংসারের যা যা কাজ করতে হয় তাতে সে কখনো ত্রুটি রাখে না। অনুপম ফিরে এসেই চা তৈরি পায়, স্থান করতে যাবার সময় কাপড়ের জন্য খুজতে হয় না, অনুপমের যা যা ভালো লাগে সবই সে করে যায়। তার একান্তই ইচ্ছে তার স্বামী সংসারের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবে, কিন্তু কোথায় অনুপমকে দিয়ে কোন কাজ হয় কি? সুরমা প্রায়ই অনুপমকে জিজ্ঞেস করে— কোথায় থাকো সারাদিন? অনুপম শুধু গম্ভীরভাবে একটি কথা বলে— 'কাজ'। কিন্তু কি কাজ করে তা সেই জানে। একবার ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে চাকরি। একবার কোন পার্টনারশিপ-এ বিজনেস আবার আরেকবার চায়ের দোকানের বিজনেস করবে বলে স্ত্রীর কাছে আবদার করে।

মানুষ অনেক সময় নিজের স্বরূপ নিজেই জানে না, অনুপম আসলে

নিজেই নিজেকে কতটুকু চেনে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। দিনের পর দিন স্ত্রী-কে যেভাবে প্রতারণা করেছে, তার অন্ধবিশ্বাসকে পদদলিত করেছে, তার তুলনা মেলা ভার। আসলে এটা বোঝা মুশকিল অনুপমের মূল ইচ্ছেটা কী? তার বাবা যখন পঞ্চাশ টাকার মাইনের একটি সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করে আনলেন, অনুপম তখন বলে উঠে— ''পঞ্চাশ টাকায় আমার কী হবে।''[১২] সে সুরমাকে আবার বলে— ''দুঃখে-কষ্টে বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমাকে পঞ্চাশ টাকার কেরানিগিরী করতে বলছেন।''[১৩] অথচ স্ত্রী-র কাছে একটা টাকা ধার চাইতে তার বাধছে না, এরকম মানুষের অভিলাষ বোঝা মুশকিল, অন্তত সুরমার মতো সরল বিশ্বাসী নারীর পক্ষে তো নয়-ই।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে বিশ্বাস, আর এই বিশ্বাস যখন থাকে না তখন সেই সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন আসবেই। অনুপম যেভাবে প্রতিনিয়ত সুরমার অগাধ বিশ্বাসকে ভঙ্গ করে তার আশাকে ধূলিসাৎ করে দিতে চায় তাতে তার মনুষ্য পদবাচ্য হবার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। এরকমই ভিন্ন আবহ নিয়ে হাজির আরেকটি গল্প 'নাটুর জীবনের শেষ কয়েক ঘণ্টা'। এই গল্পটিতে দেখি স্ত্রী প্রতারণা করেছে তার স্বামীকে, ''আমি চললুম। আমাকে আর ফিরে পাবে না। নাটুকে দেখো।''[১৪] বলে একটি চিঠি রেখে স্ত্রী লক্ষ্মী দেবী চলে যায়। এখন প্রশ্ন উঠে এই নাটু কে? এবং লক্ষ্মী দেবী কেন তাকে ছেড়ে চলে গেলেন? এই নাটু হচ্ছে লক্ষ্মী দেবীর অতিপ্রিয় পোষা কুকুর। লক্ষ্মী দেবী নাটুকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসেন। কিন্তু ভূপতিবাবু বাড়ির মধ্যে কোন জীবজন্তু ভালোবাসেন না, এ নিয়ে প্রায়ই তাদের মধ্যে মতবিরোধ চলে— ''সেই লক্ষ্মী দেবী, যাঁকে এই আট বছরের মধ্যে সন্তানের মা হতে আমি রাজি করাতে পারিনি,

আর অন্তত আমার সাহায্যে মা হবার সম্ভাবনাকেও ইদানীং যিনি বর্জন করে চলেছিলেন। তোর বয়স প্রায় দুই হলো, এই দু-বছর ধরে তোকে নিয়ে বিছানায় শুচ্ছেন তিনি, দীনেশ গাঙ্গুলির অভাবে অগত্যা তোকে নিয়েই।"[১৫] ভূপতিবাবুর মতে এই দীনেশ গাঙ্গুলির সাথে লক্ষ্মী দেবী রাত দুটো অবধি গল্প করেন আর তিনি পাশের ঘর থেকে শুনেন। লক্ষ্মী দেবীর গৃহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নাটুকে হত্যা করার বাসনা ভূপতির মনে জেগে উঠে— "আজ তোকে বধ করবো। আজ বধ করবো তোকে। —বুঝেছিস?"[১৬] লক্ষ্মী দেবীর এই কাণ্ডের জন্য ভূপতিবাবুর রাগে ক্রোধে নাটুকে একেবারে যেমন করে পারেন মেরে ফেলতে চাইছেন— "তুই জিগেস করতে পারিস, আমার কী দোষ? আমাকে কেন মারছো? কথাটা জিগেস করা কর্তব্য তোর, আমারও একটা জবাব দেয়া কর্তব্য। ভাবিস না আমি তোকে বধ করে লক্ষ্মী দেবীর উপর প্রতিহিংসা নিচ্ছি। প্রতিহিংসার কথাই ওঠে না; তার বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই আমার। তিনি চলে গিয়ে আমার কোন ক্ষতি করলেন না, বরং আমার উপকার হলো।"[১৭] ভূপতি নাটুকে মেরে ফেলার জন্য একদিন তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ভাবলেন আজ আর তাকে রেহাই দেবেন না। কিন্তু হঠাৎ তার মধ্যে বাৎসল্যরস সঞ্চারের ফলে নাটুকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন। বাড়িতে পা রেখেই দেখেন লক্ষ্মী দেবী আবার ফিরে এসেছেন। লক্ষ্মী দেবীকে দেখে নাটু একেবারে পাগল হয়ে গেছে, লক্ষ্মী দেবীও মধুর আওয়াজে বলছেন— 'নাটু! নাটি! নাটনি! আমার নাটনি! নটেশ্বর!'[১৮] এই দৃশ্য ভূপতি একেবারে সহ্য করতে না পেরে কিছুক্ষণ আগে জীবনদান করেছিল কিন্তু এখন আর সে নিজেকে আটকাতে পারেনি সে ক্রোধে বা হাতে নাটুকে চেপে ধরলো ঘাড়ে, ডান হাতে টেবিল থেকে একটা মস্ত রুটি কাটা ছুরি তুলে নিয়ে জোরে ওর গলার মধ্যে

বসিয়ে দিল। 'নরক! নরক! মুখ দেখলে পাপ হয়।'[১৯] বলে বলে লক্ষ্মী দেবী চলে গেলেন।

ছোট্ট একটি পরিসরে বর্ণিত গল্প 'ফেরিওয়ালা'। সাংসারিক জীবনের ছোটখাটো বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কথোপোকথন গল্পটিতে উল্লিখিত। গল্পটিতে দেখি শান্তনু আর নীলিমা দু'জনের কথা কাটাকাটি প্রায় লেগেই থাকে। শান্তনু যা বলে, নীলিমা তার প্রতিবাদ করবেই। জগতে এমন কোন বিষয় নেই যাতে দু'জনে একমত। শান্তনুর সবসময় বড়লোকী চাল তার মতে সংসারে যে জিনিষের দরকার নিউমার্কেটে গিয়ে ঝনাৎ-ঝনাৎ টাকা ফেলে নিয়ে আসলেই তো হয়ে যায়, আর নীলিমার মন ফেরিওলার জাঁক শুনলেই রাস্তায় ছুটে যায়। শান্তনু ফেরিওলা একেবারে পছন্দ করে না, এ নিয়ে রোজই তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। ছিটের কাপড়, তাঁতের শাড়ি, কাচের চুড়ি, সিঁদুর আলতা, চুলের কাটা, বাবলুর জন্য পুতুল আরো অনেক কিছু, নীলিমা যেন এগুলি ক্রয় করেই আনন্দ পায়। তার মতে সংসারে কত জিনিষ কখন কোনটার দরকার হয় পুরুষেরা তা কী বোঝে? শান্তনুর আর নীলিমার জীবনে ঝগড়ার কোনও বিশেষ কারণ লাগে না যে কোনও বিষয়েই তাদের মধ্যে তুমূল মতবিরোধ শুরু হয়। একদিন নীলিমা বলে উঠে— ''তুমি একা থাকলে তো ভালোই থাকতে, আমাকে বিয়ে করে গরীব হয়েছো, এ কথাটা আর না-ই বা শোনালে। আমি এলাম, তারপর বাবলু এলো, কত বাড়লো খরচ, তোমার নিজের সুখ-সুবিধে সব গেলো, সবই জানি আমি! কেন আমাকে বিয়ে করেছিলে? এত কঠিন দুঃখ কেন দিলে আমাকে? তোমার জীবনের সমস্ত কিছুর মধ্যে নিজেকে মনে প্রাণে বিলিয়ে দিয়ে ভাবি, এই তুমি চেয়েছিলে, আমাকে না হলে তোমার চলতো না, চলবেও না। ভুল, ভুল! আমরা মেয়েরা শুধু মনে মনে খেলাঘর সাজাই, তাছাড়া আর কী।''[২০]

কখনও আনন্দ আবার কখনও দুঃখ দুই মিলিয়েই জীবন। বুদ্ধদেব বসুর আরো কিছু গল্প আছে যে গুলোর মধ্যে দেখি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কোন জটিলতা নেই, কোন ভাঙন নেই। তারা সাধারণভাবে সুখে-শান্তিতে সংসার করছে। এমনই একটি গল্প হলো 'ঘরেতে ভ্রমর এলো'। গল্পটিতে দেখি স্বামী তার স্ত্রীর সম্পর্কে বলছেন— ''আমার টেবিলটাকে সে রোজ দু-বেলা এমন নিখুত ভাবে গুছিয়ে রাখে যে আমর সেই ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে যায়, যখন লেখাপড়া ব্যাপারটা ছিলো টেবিল গুছোবার উপলক্ষ। আমি যদি কখনো রাত জেগে লিখি বা পড়ি সে আমার শুতে আসার জন্য আবদার করে না, ঘরে আলো জ্বলে বলে তার যে ঘুমোবার অসুবিধে হয় এই কথাও তার মুখে শুনিনি কখনো। হয়তো সত্যিও হয় না। তবু, নালিশ করবার এমন একটা সংগত কারণ পেয়েও যে চুপ করে থাকে। তাকেই তো মহৎ বলে।''[২১] তার স্ত্রী তার কাছে আইডিয়াল, তার মতে ভ্রমরের চেয়ে ভালো বউ আর কেউ হতে পারে না— ''আপনারা-যাঁরা এখানো বিয়ে করেননি, আপনাদের চুপি-চুপি বলছি যে বিয়ে যদি করতেই হয় তো ভ্রমরের মতো মেয়ে।''[২২] ভ্রমরের কাছেও তার স্বামী সবার থেকে শ্রেষ্ঠ— ''সত্যি, কী চমৎকার পদ্য তুমি লেখো। এত ভালো আর কোনো পদ্যই আমার লাগে না।''[২৩] তারা দু'জন আদর্শ দম্পতি। একজনের প্রতি আরেক জনের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাই তাদের সম্পর্কের মূল চাবিকাঠি।

'রাধারানীর নিজের বাড়ি' গল্পটিতেও স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক দেখিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। গল্পটিতে আমরা দেখি মাত্র তেরো বছর বয়সে রাধারানী সংসার জীবনে প্রবেশ করে। যদিও তার বয়স তেরো তবুও বিয়ে ব্যাপারটা কী, রাধারানী তা মোটামুটি জানতো বা বুঝতো, তাই সে সংসার জীবনে নিজেকে

একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছিল। রাধারানীর স্বামী গিরিজা প্রসন্ন কলকাতায় এক সওদাগিরি হাউসে পঁচাত্তর টাকা মাইনের চাকরি করত। তার নিজের কোনও মতামতই ছিল না। অত্যন্ত অস্পষ্ট গোছের মানুষ, তার নিজস্ব কোনও ভাবনা ছিল না। সে চুপচাপ থাকে, যেমন দিন কাটে কাটুক, যতক্ষণ না কেউ বলে দেয় কী করতে হবে, সে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। এরকম স্বামী পেয়ে রাধারানীর জীবন ধন্য। সে তার স্বামীকে যা-ই বলে গিরীজা তা কোনও প্রশ্ন না করেই করে যায়। রাধারানীর একান্ত ইচ্ছে যে তার একটা নিজের বাড়ি হবে। তার এই আশা পূরণ হলো সে কলকাতায় এলো— ''তার বাড়ি! তার নিজের! ভাবতেই রাধারানীর শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ওঃ, কী করে সে সাজাবে এই বাড়ি, করে তুলবে সুন্দর, গড়ে তুলবে তার সংসার, তার নিজের সংসার। এ বাড়ি তাকে নিয়ে ভরা; তার ইচ্ছে এখানে চরম। সেই জীর্ণ রুদ্ধশ্বাস বাড়ির সঙ্গে রাধারানী কান মাথা ডুবিয়ে প্রেমে পড়ে গেলো।''[২৪] তাদের সংসার খুব সুন্দরভাবে চলতে থাকে রাধারানী যা-ই বলে গিরীজা তা এনে দেয়, রাধারানী একটু একটু করে তার বাড়ি সাজাতে লাগে। ইতিমধ্যে রাধারানী একটি মৃত সন্তানের জন্ম দিল। রাধারানীর শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়ল, দরকার হলো বড়ো ডাক্তার ডাকবার। রাধারানী ব্যাকুল হয়ে বলল— ''কী যে করছো এতগুলো টাকা—''[২৫] ইতিমধ্যে গিরীজা তার স্ত্রীকে ভালোবাসতে আরম্ভ করেছিলো। যে মানুষ সম্পূর্ণ আত্ম সচেতন নয়, সে যেমন করে ভালোবাসে অন্ধভাবে, মূঢ়ভাবে। স্ত্রীর চিকিৎসায় গিরীজা তার সঞ্চয় প্রায় শেষ করে ফেলল। দুর্বল শয্যাশায়ী-রাধারানী মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো। ''প্রতিটি টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে যেন তার শরীরের এক এক ফোঁটা রক্ত। এ টাকা দিয়ে কত-কী হতে পারতো বাড়ির শ্রী একেবারে

ফিরিয়ে দেয়া যেতো। কেনই বা লোকে টাকা জমায়। এরকম হবে জানলে সে আগে থেকেই খরচ করে দিতো একটি পয়সা হাতে রাখতো না।”[২৬]

কি যে ছিলো বিধাতার ইচ্ছে এত সুন্দর একটি সংসারে ক’দিন পরে পরেই দুঃখ এসে যায় রাধারানীর স্বাভাবিক চলতে থাকা সংসার অস্বাভাবিক হয়ে যায়। রাধারানীর পরপর তিনটি সন্তানের মৃত্যু ঘটে। রাধারানী মেনেই নিয়েছিলো মা হওয়ার সুখ যে কখনো ভোগ করতে পারবে না, এমন অবস্থায় সে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিল, কিন্তু সেও এক বছর পর মারা গেলো। এই দুঃখের দিনে গিরীজা রাধারানীর সঙ্গ ছাড়েনি। সে তার স্ত্রীকে যেমন করে পারে সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করে।

বুদ্ধদেব যে রোমান্টিক, রেমান্টিকতায় সে অবিচল, এ কথায় কারো কোন সন্দেহ নেই। বুদ্ধদেব বসুর গল্পের মূল বিষয়ই হচ্ছে প্রেম। এই প্রেমকে হাজির করতে গিয়ে কোন কোন গল্পে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ভাঙন এনেছেন, তাদের সম্পর্কে প্রেম আছে কিন্তু কোথাও কোন একটি কারণে সেই সম্পর্কে ফাটল এসে গেছে। আবার কোন কোন গল্পে দেখি স্বামী-স্ত্রী খুব সুন্দরভাবে সাংসারিক জীবন অতিবাহিত করছে। এভাবেই বুদ্ধদেব বসু তাঁর আরো অনেক গল্পে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েনের বিভিন্ন পর্যায় দেখিয়েছেন।

এক ভিন্ন আবহ নিয়ে বর্ণিত বুদ্ধদেব বসুর ‘অসমাপ্ত গল্প’। গল্পটিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন। গল্পটির কেন্দ্রবিন্দুতে আছে রাজনৈতিক বাতাবরণ ও সামাজিক প্রেক্ষাপট। গল্পটিতে আমরা দেখি এক পল্লী যুবক শহরে এসেছে কলেজে পড়বে এই স্বপ্নে। তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব নিলেন সেখানকার কলেজের এক ইংরাজী শিক্ষক ও তার

স্ত্রী সরমা। সরমা প্রথমতঃ সেই যুবককে গ্রহণ করতে পারছিল না, কিন্তু পরবর্তীতে সেই যুবকটিই যেন সরমার সবকিছু হয়ে উঠে। সরমার জীবনের একটি আদর্শ আছে, সে কারুর স্মরণাপন্ন হয়ে থাকতে চায় না। সংসার পরিচালনায় তার গভীর আনন্দ, এর ভিতর দিয়ে সে নিজেকে ফুটিয়েছে, সেখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ সে সহ্য করতে পারে না। এমএ পাশ হয়েও সে মাস্টারি করেনি, নানা যোগ্যতা নিয়েও বাইরে তার বিশেষ আনাগোনা নেই। বাইরে থেকে তার ডাক আসে অনেক, কিন্তু সে ঘরে থাকতেই ভালোবাসে। অমুক বাবুর স্ত্রী বলে লোকে তাকে সম্মান দিতে চাইলে সেটা তার অপমান বলে মনে হয়। একবার তার স্বামী তাকে নিয়ে কোথাও যেতে চাইলে সরমা বলে ওঠে— ''তুমিই যেখানে আসল, সেখানে আমার যাওয়ার কোন মানে হয় না। তোমার গলায় যদি মালা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে আমার গলায়ও তার চেয়ে একটু ছোটো একটা মালা পরাবে, ভাবতেই লজ্জা করে আমার।''[২৭] এভাবেই ছোটখাটো মতবিরোধ টানাপোড়েন নিয়ে চলতে থাকে তাদের জীবন। এদিকে সরমার আদর ও স্নেহে সেই যুবক যার নাম গণেশ বাড়তে লাগল। সেই যুবকটি অনেক বদলে গেছে।

গল্পটিতে আমরা হঠাৎ এক নতুন মোড় দেখি। ডিসেম্বরের শেষে হঠাৎ জাপানি যুদ্ধ বাধলো। আর বড়দিনের ছুটি আসতে না আসতে সমস্ত কলকাতা যেন মৃত্যুভয়ে খেপে গেলো। তাই শিক্ষক মহাশয়ের সমস্ত পরিবার শিমূলতলায় একটি ভাড়া বাড়িতে আশ্রয় নিল। গণেশও তাদের সঙ্গে গেল। গণেশ সরমার আদর ও স্নেহে বাড়তে লাগল। গণেশের মধ্যে এখন বিস্তর ব্যবধান, যে ছেলেটির জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে ওঠা সেই ছেলেটির এখন পড়াশোনায় কোন মন নেই। সে রাজনীতিতে ঝাপিয়ে পড়েছে। দেশের লোকের

দূর্গতি দূর করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আজ এই সভা, কাল ছাত্র সমিতির বৈঠক, পরশু রিলিফ ক্যাম্প এই নিয়ে মত্ত। আর গণেশের সংগঠনের প্রেসিডেন্ট হল সরমা। গণেশকে নিয়ে প্রায়ই সরমা ও তার স্বামীর মধ্যে কথা কাটাকাটি লেগেই থাকে।

গণেশের সাথে সাথে সরমার নামও আস্তে আস্তে ছড়াতে লাগল। একদিন খবরের কাগজে সরমার নাম দেখে তার স্বামী খুব খুশি হয়ে যখন সরমাকে দেখতে বলেছিল তখন সরমা বাঁকা চোখে দেখে বলে উঠল— ''তোমার স্ত্রীর ছবি কাগজে উঠতে পারে তা বুঝি তুমি ভাবতেও পারো না?''[২৮] সরমা সমাজসেবার কাজে নিজেকে এতটাই বিলিয়ে দিয়েছে যে স্বামীর জন্য তার কোন সময়ই নেই। তারা দু'জনের এখন প্রায় দেখাই হয় না তাই সরমার স্বামী আক্ষেপের সাথে উচ্চারণ করেন— ''আজ হঠাৎ অনেকদিন পরে সরমার সঙ্গে অসময়ে আশাতীত আমার দেখা। মনে মনে ইচ্ছে হচ্ছিলো ও একটু বসুক, একটু কথা বলি বিশ্বজগতের কথা নয়, ন্যায়-অন্যায় সমস্যা নয় যে কথা মুহূর্তকে রঙিন করে মুহূর্ততেই বিলিয়ে যায়, এমন কথা।''[২৯]

গণেশকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া আর মতবিরোধ যেন প্রতিদিনের ব্যাপার হয়ে উঠে। একদিন তো সরমা প্রায় প্রতিবাদিনী কণ্ঠে তার স্বামীর উপর গর্জে ওঠে যখন তার স্বামী গণেশকে মায়ের অসুস্থতার খবর দিয়ে দেশে যাওয়ার কথা বলেন— ''তুমি মানুষকে দয়া করতে জানো ভালোবাসতে জানো না। যতদিন গণেশকে দয়া করতে পেরেছো, ততদিন ওর প্রতি প্রসন্ন ছিলে তুমি, যেদিন ও তোমার দয়ার গণ্ডী অতিক্রম করেছে, সেদিন থেকে বিরূপ হয়েছো। ...যে কোনো ছুতোয় চেষ্টা করছো ওকে দেশে পাঠিয়ে দিতে, সেখানে গিয়ে আবার চাষা

হোক, মুর্খ হোক, এই তোমার ইচ্ছে।”[৩০]

সরমা যেন থামতেই রাজি না একের পর এক অভিযোগ করেই যাচ্ছিলো— ‘‘আমি তোমার অধীনে থাকবো, আর তুমি অত্যন্ত ভালো স্বামী হবে— এই ছিলো তোমার আদর্শ। আজ আমি যে তোমার সমকক্ষ হয়েছি, নিজের একটা স্বতন্দ্র অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছি এটাও তুমি খুব ভালো চোখে দেখছো না। এতে তুমি সুখি নও— আমার কৃতিত্ব তোমার ভালো লাগে না, আমার খ্যাতি তোমাকে পীড়া দেয়। ... এটা তুমি জেনে নাও যে তোমার ইচ্ছেমতোই সব হবে না, সকলেই তোমার কাছে ছোটো হয়ে থাকবে না চিরকাল, ভিন্ন ভিন্ন জীবন ভিন্ন ভিন্ন সার্থকতার পথেই এগিয়ে চলবে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সুখে হোক, দুঃখে হোক, এ কথাটা মেনে নিতেই হবে তোমাকে।”[৩১] সরমার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, প্রত্যেকটি কথার উচ্চারণ স্পষ্ট, তার বাক্যবন্ধগুলো ছেলেমেয়েদের অতিক্রম করে ঘরের প্রতিটি দেয়ালে গিয়ে আঘাত করলো।

গল্পশেষে এক আশ্চর্য বাস্তবের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। যেখানে গল্পের নায়ক অর্থাৎ সরমার স্বামীকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় কিন্তু তার কি অপরাধ তা সে নিজেও না। সে ভেবেছিল সরমা তার খোঁজ নিতে আসবে, কিন্তু সে আসেনি।

একটি চিঠিকে আবহ হিসাবে ব্যবহার করে ছোটখাটো কাহিনী নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি মধুর দাম্পত্য সম্পর্কে উল্লেখ মিলে বুদ্ধদেব বসুর ‘চিঠি’ গল্পটিতে। স্বামী বাইরে যাবে এবং সেখানে গিয়ে তার স্ত্রীকে চিঠি লিখবে বা লিখতে পারবে এটা ভেবেই তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। তাদের বিয়ের সাত বছর হয়েছে, আর এই সাত বছরই তারা কাছাকাছি রয়েছে এরকম একটুও

ফাক আসেনি যে তারা চিঠি লিখবে। সুরেন তার পৈতৃক ভিটে, মস্ত বড় পরিবারের মধ্যে এই ছোট শহরেই সে মানুষ হয়েছে। তার বয়স যখন কুড়ি তার মা ঐ শহরেরই এক বিধবার মেয়ে শোভাকে খুঁজে বের করে তার বিয়ে দিলেন। শোভার মাও শহরে অনড়, দেশে তার বাড়ি ঘর নেই, অন্য কোথাও যাবার নেই। বিয়ের পরে শোভা যখন মাঝে মাঝে তার মার কাছে গিয়ে থাকতো, সুরেন তখন প্রায় রোজই সেখানে যেত। বিবাহিত জীবনের প্রথম অবস্থায় স্ত্রী বাপের বাড়ি গেলেই উচ্ছ্বসিত পত্র স্রোত উভয়দিকে ধাবিত হতে থাকে— বাঙালি দম্পতির মধ্যে এটাই রেওয়াজ। বিয়ের পরে সুরেন তার দাদার সঙ্গে জুটে গেলো বীমার দালালির কাজে। সাত বছরের মধ্যে সুরেনকে যখনই বাইরে যেতে হয়েছিল তা আশেপাশের কোন গ্রামে, তাকে বাইরে যাওয়া বলে না। কাজের চাপ বাড়লো, কোম্পানি বড় ভাইয়ের তদারকে সেই শহরেই খুলল এক ব্রাঞ্চ অপিশ। অপিশের কাজে সুরেন ছাড়া তার দাদার কিছুই চলে না। নিজের বাড়িতে বসে দু পয়সা রোজগার করে বেশ ভালোই ছিল সে, স্ত্রীকে নিয়েও সে সুখী ছিলো। মা, দাদা, বৌদি, দিদি, ভাগনে, নানা বয়সের ছেলেমেয়ে, নানা সম্পর্কের ভাইবোন ইত্যাদির মধ্যে একরকম করে ফুটে উঠেছিল শোভার সঙ্গে তার চুপি-চুপি ভালোবাসা। সুরেনের মাঝে মাঝে মনে হতো, ‘‘সাত বছর ধরে শুধু ওর কাছেই থাকলাম। হঠাৎ ইচ্ছে করতো, কয়েকদিনের জন্য দূরে কোথাও চলে যেতে, শুধু ওকে ফেলে থাকতে কেমন লাগে, তা জানবার জন্য। ফাঁকা ফাঁকা ঠেকবে, কিন্তু সেই সমস্তটা ফাঁকা যেন ওকে দিয়ে ভরা। এখানে এত কথা, এত কাজ, এত ভিড়ের মধ্যে ওকে যেন ভালো করে দেখাই যাচ্ছে না, অন্য কোথাও গেলে ওর সবটা ধরা পড়বে।’’[৩২]

অবশেষে সুরেনের জীবনে সে দিনটি এল, এখন সে কলকাতায় যাবে। প্রতি বছর তাদের কোম্পানির বাৎসরিক ভোজে ও পরামর্শ সভায় কলকাতার অপিশ থেকে তাদের নিমন্ত্রণ আসে, প্রতিবছর নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন তার দাদাই, কিন্তু এ বছর তিনি অসুস্থ বলে সুরেনকে যেতে হচ্ছে। এতদিনের প্রতীক্ষার আজ অবসান ঘটবে। সে কলকাতায় পৌছেই শোভাকে চিঠি লিখবে, একথা মনে করতেই তার মন আনন্দে ভরে উঠল। চিঠি নিয়ে তার মনে বিরাট আনন্দ, কিন্তু কোনদিন সে কাউকে চিঠি লিখেনি, চিঠি লেখা যে দাম্পত্য জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ তা সে জানতো। তার বন্ধুরা কেউ কেউ তাদের স্ত্রীদের চিঠি দেখাতো তাকে— কী মস্ত মস্ত ব্যাপার, কত সুন্দর সুন্দর কথা, সুরেন এগুলো পড়ে মুগ্ধ হয়ে যেত। একটা চিঠির কয়েকটা লাইন সে কখনো ভুলতে পারেনি— ''জানালার কাছে নিমগাছ থেকে ঝরে পড়ছে ছোট ছোট শাদা ফুল, কয়েকটা উঠে এসে পড়ল আমার বিছানায়। তক্ষুণি মনে পড়ে গেলো তোমার কথা; লিখতে বসলুম চিঠি।''[৩৩] সুরেন এরকম চিঠি পেতে চায় এবং লিখতেও চায়, কিন্তু তার জীবনে কখনো এই সৌভাগ্য আসেনি, কারণ শোভা সবসময়ই তার চোখের সামনেই থাকত, মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে হতো শোভাকে চিঠি লিখে তার বালিশের নীচে রেখে দিতে, কিন্তু তাও হয়নি।

কলকাতায় পৌছেই সে ভেবেছিলো শোভাকে চিঠি লিখবে, কী লিখবে তা সে জানে না, সে তার মনের কথা খুলে বলবে শোভাকে এই চিঠির মাধ্যমে। কলকাতায় এসে সুরেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠল। এত বড় শহর, এত লোক এরমধ্যে সে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, চিনতে পারছে না নিজেকে। তাদের ছোট শহরের রাস্তায় বেরোলে সে আস্তে আস্তে হেটে হেটে যায়, পদে পদে

সাক্ষাৎ হয় বিভিন্ন লোকের সাথে, আর এখানে কেউ কাউকেই চিনে না কারোর জন্য কারোর কোন সময় নেই, সবাই শুধু চলছে আর ছুটছে— এই ব্যাপারটা সুরেনের মনে বিভীষিকার মতো ঠেকলো এবং বারে বারে মনে পড়লো শোভার কথা। কর্মক্ষেত্রে তার খুব প্রশংসা হলো, স্বয়ং গোল্ডিং সাহেব তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছেন, কোম্পানি থেকে তাকে একটা বাধা মাইনে দেবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু কিছুই তার ভালো লাগছিলো না। তার চারদিক এমন ফাঁকা সে এমন একা, এত অসুখী তার জীবনে এর আগে কখনো লাগেনি। তার শুধু শোভার কথা মনে পড়ছিল। শোভার মুখ, মনে পড়ছিল শোভার লুটিয়ে পড়া আচলের লাল পাড়, মাত্র একদিন হয়েছে তার বাড়ি থেকে বেরোনোর কিন্তু তার মনে হচ্ছিল কতদিন থেকে সে শোভাকে দেখেনি। এতক্ষণে মনে পড়ল তার সেই চিঠির কথা, সাত বছরের মধ্যে প্রথম লিখবে সে চিঠি, মনের কথা দিয়ে ভরিয়ে ফেলবে চিঠি খানি, সে ভেবেছিল লিখবে— ''তোমাকে ছেড়ে এসে কিছুই ভালো লাগছে না, বার বার মনে পড়ছে তোমাকে।''[৩৪] কিন্তু সেই কথাগুলো সে লিখতে পারেনি। সে প্রথমে লিখলো 'শোভা'। এই শোভা কথাটার উপর কয়েকবার কলম বুলালো, সে ভাবতে লাগলো আর কি লেখা যায়। কী বলে আরম্ভ করবে, তা সে বুঝতে পারছিলো না। 'তোমাকে ছেড়ে এসে কিছুই ভালো লাগছে না, বারবার মনে পড়ছে তোমাকে'— এই তো তার দুটি কথা এক লাইনেই শেষ হয়ে যায়। ঐ দুটি কথা দিয়ে কীভাবে চিঠির পাতা ভরাবে? তার সেই চার পৃষ্ঠা জোড়া চিঠি, যার ছবি সে মনে মনে একেছিলো। সত্যি কি বারবার তার মনে পড়ছে শোভাকে, তাও যেন সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলো না। তারপর হঠাৎ করে উঠে সে লিখে ফেলল তার চিঠিখানা— ''আজ সকালে এখানে

নিরাপদে পৌঁছেছি। পথে কোনো অসুবিধে হয়নি। মানিকের জন্য চিন্তিত আছি। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আর কী লিখবো। ইতি।”[৩৫] তারপর আবার তার মনে পড়ল আরো কিছু কথা— ‘‘মনে হচ্ছে আমার ঘরের টেবিলের বা দিকের দেরাজে গোটা সাতেক খুচরো টাকা পড়ে রয়েছে। দেরাজটায় চাবি লাগিয়ে রেখো, আর যদি চাবি খুঁজে না পাও, টাকাগুলো তোমার হাত বাক্সে তুলে রেখো।”[৩৬] কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিলো বলে সুরেন মনে মনে একটু শান্তি অনুভব করলো। যাই হোক সে ভরে ফেলল চিঠিখানা কিন্তু সে ভেবেছিলো চিঠিখানা শোভাকে দিয়ে শুরু করবে আর তাকে দিয়েই শেষ করবে কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। গল্পটিতে বুদ্ধদেব বসু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুন্দর এক দাম্পত্য সম্পর্কের উদঘাটন করেছেন। যে সম্পর্কে প্রেম আছে, একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধ আছে। সবমিলিয়ে বলা যায় তারা দু’জন আদর্শ বাঙালি দম্পতি।

বুদ্ধদেব বসুর অনেক গল্পেই মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনের দাম্পত্য সম্পর্ক প্রায়ই একটি সেতুহীন পরিস্থিতিতে দেখা যায়। কখনো স্থূলস্বভাব, আধিপত্য অভ্যস্ত স্বামী স্ত্রীকে মূল্য দেবার কথা ভাবে না; অনুভব করে না স্ত্রীর মনের চাওয়া-পাওয়া, যেমন ফেরিওলা তুলসী গন্ধ ইত্যাদি গল্প এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; আবার কোন গল্পে কখনো অধ্যাপক বা লেখক স্বামীকে সম্পূর্ণই ভুল বোঝে বা অগ্রাহ্য করে তার নির্বোধ অথবা বস্তুবাদী স্ত্রী যেমন ‘দু-একটা স্বর’, ‘অসমাপ্ত গল্প’ প্রভৃতি গল্পে। বুদ্ধদেব বসুর গল্পের মূল বিষয়ই হচ্ছে প্রেম। এই প্রেমকে হাজির করতে গিয়ে কোন কোন গল্পে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ভাঙন এনেছেন, তাদের সম্পর্কে প্রেম আছে, কিন্তু কোথাও কোন একটি কারণে সেই সম্পর্কে বিচ্ছেদ এসে

গেছে। আবার কোন গল্পে দেখি স্বামী-স্ত্রী খুব সুন্দরভাবে সাংসারিক জীবন অতিবাহিত করছে। এভাবেই বুদ্ধদেব বসু তাঁর অনেক গল্পে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েনের বিভিন্ন পর্যায় দেখিয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১। বসু বুদ্ধদেব/ বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প/ 'তুলসী গন্ধ'/ সুধাংশুশেখর দে/ দেজ/ ২০০০/ পৃ-৬৩

২। তদেব/ পৃ-৬৩

৩। তদেব/ পৃ-৬৩

৪। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'তুমি কেমন আছো'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-৪২১

৫। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'আদর্শ'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-৪০২

৬। তদেব/ পৃ-৪১১

৭। তদেব/ পৃ-৪১২

৮। তদেব/ পৃ-৪১৫

৯। তদেব/ পৃ-৪১৫

১০। তদেব/ পৃ-৪১৬

১১। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'হতাশা'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-১৫৮

১২। তদেব/ পৃ-১৬৭

১৩। তদেব/ পৃ-১৬৭

১৪। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'নাটুর জীবনের শেষ কয়েক ঘণ্টা'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-৩৮১

১৫। তদেব/ পৃ-৩৮২

১৬। তদেব/ পৃ-৩৮৫

১৭। তদেব/ পৃ-৩৮৫

১৮। তদেব/ পৃ-৩৮৯

১৯। তদেব/ পৃ-৩৮৯

২০। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ ''ফেরিওলা''/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-১৫৬

২১। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ ''ঘরেতে ভ্রমর এলো''/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-১২২

২২। তদেব/ পৃ-১২২

২৩। তদেব/ পৃ-১২২

২৪। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'রাধারানীর নিজের বাড়ি'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-১২৯

২৫। তদেব/ পৃ-১৩১

২৬। তদেব/ পৃ-১৩১

২৭। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'অপ্রকাশিত ১৯৪৫'/ অসমাপ্ত গল্প/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-২৩৩

২৮। তদেব/ পৃ-২৪৭

২৯। তদেব/ পৃ-২৪৮

৩০। তদেব/ পৃ-২৫৪

৩১। তদেব/ পৃ-২৫৪

৩২। মিত্র অশোক কুমার ও বসু বিষ্ণু (সম্পাদনা)/ শতবর্ষের সরস গল্প/ 'চিঠি'/ পুনশ্চ/ পৃ-৩৮২

৩৩। তদেব/ পৃ-৩৮৩

৩৪। তদেব/ পৃ-৩৮৪

৩৫। তদেব/ পৃ-৩৮৪

৩৬। তদেব/ পৃ-৩৮৪